শিশু পৃথিবীর জোড়া চাঁদ, ব্যাঙ্কের বিয়ে ও বিজ্ঞান আন্দোলন, বাবুই পাখির বাসা, চাঁদের আলো।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-৯ সংখ্যা - ৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর / ২০১২ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

ভারতে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ - একটি ভাবনা

বিশ্বের যে কোন দেশের সম্পদশালী এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য প্রায় ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ অরণ্য সম্পদ প্রয়োজন। ভারতে অরণ্যের পরিমান ২২.৮ শতাংশ প্রায় (বর্তমান) যা পৃথিবীর বহু চর্চিত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের চেয়েও অনেক বেশী। সেদিক থেকে আমরা যথেষ্টই গর্ববোধ করতেই পারি।

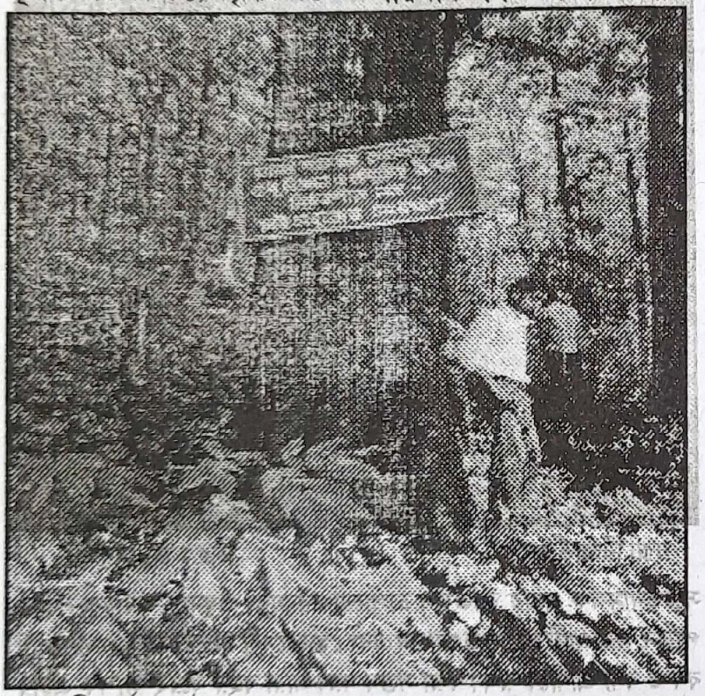

বক্সা রিজার্ভ ফরেস্ট

প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ বন ও বন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। উত্তরে তুষার শুভ্র হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার তটভূমি এবং পূর্বে অরুনাচলপ্রদেশের শেষ সীমানা থেকে পশ্চিমে গুজরাটের তটভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এদেশের বনভূমি। ভৌগলিক পরিবেশের বৈচিত্রের মতই বিচিত্র এখানকার বন ও বন্য প্রাণী। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে বন ও বন্য প্রাণীর প্রভাব অপরিসীম।

এরপর 2 পাতায়

স্পোর্টস মেডিসিন

স্পোর্টস মেডিসিন বলতে গেলে সাধারণভাবে যা মনে হয় স্পোর্টসে বা খেলাধূলার জগতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত ঔষধের কথা। আসলে কিন্তু তা নয়। বাস্তবে স্পোর্টস মেডিসিনের অর্থ ব্যাপক। খেলোয়াড় তৈরী করার জন্য বা ক্রীড়া প্রদর্শন করার জন্য যে দিকগুলি আছে অর্থাৎ ট্রেনিং, টেকনিক, স্ট্রাটেজি, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা পুষ্টিকর সঠিক খাদ্যাভ্যাস, প্রতিযোগিতামূলক খেলার ক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুন্য প্রদর্শন, জয়লাভ এগুলিও এই স্পোর্টস্ মেডিসিনের অন্তর্গত।

বস্তুত স্পোর্টস মেডিসিনের ক্ষেত্র— খেলার জগতে চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ভেষজ বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকগুলিও হওয়া উচিত। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা। তাই এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রতিরোধমূলক, আরোগ্যকর এবং পূর্বের সক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারগুলি এসে পড়ে। P.H. Collin তাঁর বই 'Dictionary of Medicine' এ বলছেন— 'Sports Medicine is the student of the treatment of sports in-

এরপর 4 পাতায়

নীল চাঁদের রহস্য

মাস বলতে আক্ষরিক অর্থে সেই কালপর্বকে বোঝায় যার মধ্যে ১টি পূর্ণিমা ও ১টি অমাবস্যা থাকবে। ইংরেজি বছরে এক একটি মাসে কখনো কখনো দুটো পূর্ণিমা এসে পড়ে। আগষ্ট মাসে পাওয়া গেছে সে রকম দুটি পূর্ণিমা। একটি ২ তারিখে আর অপরটি ৩১ তারিখে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় পূর্ণিমার চাঁদকে 'ব্লু-মুন' বা 'নীল চাঁদ বলে থাকেন। ১২ মাসে ১২টি পূর্ণিমা হয়। ইংরেজী ক্যালেন্ডারের ১৯টা বছরে ২২৮টা মাস পাই। অর্থাৎ ১৯ x ৩৬৫.২৪২৫ দিন = ৬৯৩৯.৬১ দিন (প্রায়)। আবার চান্দ্রমাস বা পূর্ণিমা পুনরাগমনের সময় = ২৯.৫৩০৬ দিন। দেখা যায়, ২৩৫টি চান্দ্র মাস = ৬৯৩৯.৬৯ দিনের সমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৯ বছরে প্রতি মাসে গড়ে একটি করে পূর্ণিমা

এরপর 3 পাতায়

ভারতের বন ও বন্য প্রাণী

1 পাতার পর

এই সুবিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার কতগুলি সুনির্দিষ্ট আইন প্রনয়ন করেছেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল আজও বন ও বন্য প্রাণীর আবাসস্থল নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। এখনও আমরা এ বিষয়ে উদাসীন। পরিণতিতে বন্য প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে মরণ-মারণ লড়াই আজও অব্যাহত। উত্তরবঙ্গে ও সেই লড়াই অবলীলাক্রমে চলছে-বন লাগোয়া জনবসতিতে (বিশেষ করে ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে)। মানুষ এবং বন্য প্রাণীদের আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের গল্প গাথা সংবাদ মাধ্যমের পর্দা ও পাতায় প্রায় প্রতিনিয়তই স্থান পায়।

উত্তরবঙ্গে বন্য প্রাণীদের মধ্যে হাতির আক্রমণেই সর্বাধিক জনসাধারণ নিহত এবং আহত হন। সাথে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি তো আছেই। বিষয়টি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে দক্ষিণবঙ্গে মানুষ সুন্দরবনের বাঘের (রয়াল বেঙ্গল টাইগার-পৃথিবীর একমাত্র বাঘ যারা মানুষ খেতেই বেশি ভালোবাসে) ভয় করলেও উত্তরবঙ্গের মানুষ হাতিকেই বেশি ভয় পায়। অথচ হাতির স্বভাব এবং খাদ্য অভ্যাসের নিয়ম অনুসারে এরা শাকাহারী।

কেন তারা এখন এত বেশি হিংস্র হয়ে যাচ্ছে যে, বুধিয়া ওঁরাও (বনবস্তী বাসীদের প্রতিনিধি)দের মত শত শত বন লাগোয়া গ্রামের অধিবাসীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে? যাদের প্রায়শই অভুক্ত থেকে হাতি তাড়াতে হয়। কারণটা অবশ্য প্রশাসনিক কর্তা এবং সরকার উভয়ের অজানা নয়। ইতিমধ্যে অরণ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে বিল-২০০৫ নিয়ে সংসদে চাপানউতোর চলছেই। বস্তুতঃ বিলটি পরিমার্জন না করতে পারলে বন ও বন্য প্রাণীর সাথে সাধারণ মানুষের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। তারই মাঝে নিরীহ হাতি সমেত অন্যান্য বন্য প্রাণী এবং পাশে থাকা এ সমস্ত নিরপরাধ মানুষের আর্তনাদ ক্রমশঃ বেড়েই চলছে ঠিক ডারউইনের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' তত্ত্ব মেনেই।

তাহলে কি এরা দুজনাই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে মরবে এবং মারবে? এই সংগ্রাম কি রোখা সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই সম্ভব।

যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি প্রশাসনিক কর্তা যদি সর্বপরি সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

১) ভারতের পরিবেশ এবং বনমন্ত্রক বিভাগের বাৎসরিক আর্থিক বরাদ্দ বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুন বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলোর বন বিভাগের বাৎসরিক আর্থিক বরাদ্দও বাড়ানো উচিৎ।

২) উপযুক্ত সংখ্যক বনাধিকারিক অন্যান্য আধিকারিক সহ নিচুতলার কর্মচারী বিশেষ করে যারা বন সুরক্ষার কাজে সরাসরি যুক্ত তাদের সংখ্যা যথেষ্ঠ পরিমাণে বাড়ানো উচিত।

৩) কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ আধুনিক মানের অস্ত্র এবং যানবাহন এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা - বন সুরক্ষার কাজে, যাতে বন্যপ্রাণী পাচারকারীদের হাত থেকে বন ও বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উপযুক্ত এবং যথেষ্ঠ যানবাহনের (যা টহলদারীতে প্রয়োজন) অভাবে বেশির ভাগ সময়ে হাতির আক্রমণ ঠেকাতে হাতি তাড়ানোর টহলদারী দল সময় মতো পাওয়া যায় না। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ এবং বন্যপ্রাণী উভয়ই ক্ষয়ক্ষতির প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে ওঠে।

৪) বন সুরক্ষার সাথে সরাসরি যুক্ত কর্মচারীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক (কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাতদিন পাহারা দিতে হয়) সহ তাদের সরকারী আবাসস্থল উপযুক্তভাবে বাসযোগ্য করে তোলা দরকার কারণ বনাধিকারিকসহ অন্যান্য আধিকারিকদের যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ কর্মচারীদের উপযুক্ত সরকারী আবাসস্থলের অবস্থা খুব ভালো নয়। হয়তো এসব কারণেও অনেক সময় সাধারণ কর্মচারীরা তাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এড়িয়ে চলে—ফলশ্রুতিতে বন লাগোয়া বাসিন্দা এবং বন্যপ্রাণী উভয়কেই মাশুল গুনতে হয়।

৫) বন সুরক্ষা কমিটি, বাস্তু উন্নয়ন সমিতি সহ আরও যে সমস্ত স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং বনবিভাগের সংযুক্ত নাগরিক কমিটি বা সমিতি আছে সেগুলোকে দলমত নির্বিশেষে আরও জোরদার করা দরকার।

৬) বন আধিকারিক সহ অন্যান্য সমস্ত স্তরের বনকর্মীদের মধ্যে এবং জনমানসে বন ও বন্য প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও জোরদার সচেতনামূলক প্রচার অভিযান চালানো দরকার। শুধুমাত্র অরণ্যক সপ্তাহ পালন, বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উৎযাপন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় বন ও বন্য প্রাণীকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সারা বছর ধরেই ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো দরকার—সাধারণ মানুষকে এদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাবাতে শেখাতে হবে—প্রত্যেকের উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে যে, প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে বন ও বন্য প্রাণী এমন একটি সম্পদ যা একবার নিঃশেষ হয়ে গেলে পুনরায় তাকে ফেরানো সম্ভব নয়।

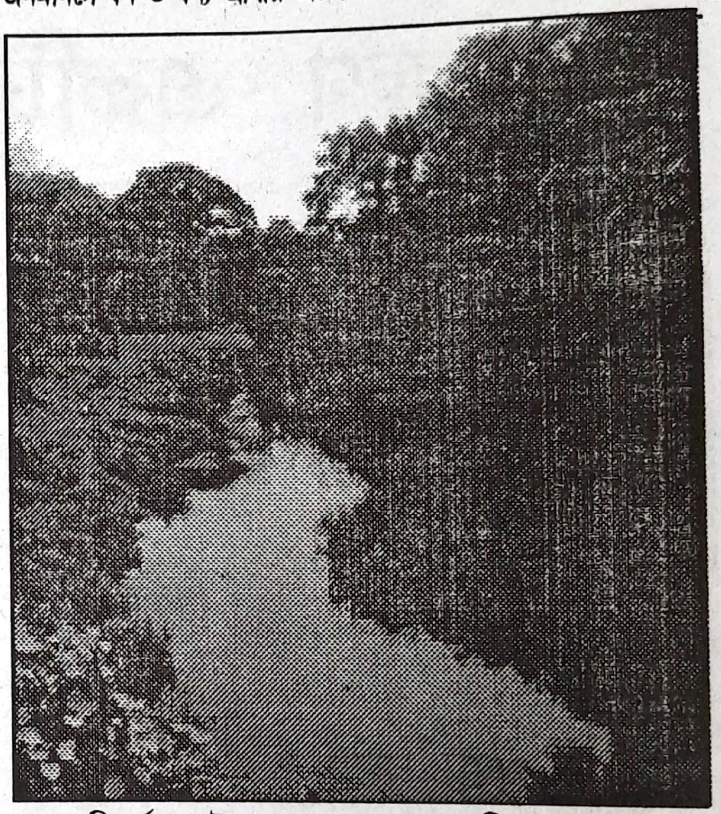

বক্সা রিজার্ভ ফরেস্ট চিত্র ঃ জয়দেব দে

একথাও ঠিক যে বন্য প্রাণী গবেষণার উৎসাহী ব্যক্তি, বিজ্ঞানী। বনাধিকারিক সহ অন্যান্য বন কর্মচারী ছাড়াও প্রশাসক, মন্ত্রী ও আমলা সহ প্রতিটি মানুষকে বন ও বন্য প্রাণী সম্পর্কে সচেতন হতে হবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেদের তাগিদেই।

সম্প্রতি কিছু মেকি প্রকৃতি প্রেমী সংস্থা 'প্রকৃতি প্রেমের' আড়ালে বন ও বন্য প্রাণীর ধ্বংসের কাজে লিপ্ত। এদেরকেও নিজেদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তবেই হয়ত বাঁচতে পারে এই প্রাকৃতিক সম্পদ, নচেৎ নয়। — লেখক রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব। মোঃ-৯৪৭৪৪১৭১৭৮

নীল চাঁদের রহস্য

1 পাতার পর

হবার পরও ৭টি পূর্ণিমা (২৩৫টি -২২৮টি =৭টি) বাড়তি থেকে যায়। এরাই ব্লু-মুন তৈরি করে। তাই ব্লু-মুন বিরল ঘটনা হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। হিসেব অনুযায়ী এই ৭টা পূর্ণিমা চাঁদ এক-একটা হবে ১৯÷৭=২.৭ বছর (প্রায়) পরপর। সেই মতোই এই বছরের আগামী ৩১ আগষ্ট একটা ব্লু-মুন হবে। ব্লু-মুন কোনও বছরে একবার এলেও, কখনো বছরে দুবারও আসে। সেটাও খুব বিরল ঘটনা। যেমন ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে আর মার্চ মাসে একটা করে দুটো ব্লু-মুন এসেছিল। তার আগে ১৯১৪ সালে এরকম দুটো নীল চাঁদ আকাশে দেখা গিয়েছিল। একই বছরে দুবার নীল চাঁদ দেখা গেলে সেটা প্রায় হয় জানুয়ারি ও মার্চ মাসে। কারণ এই দুই মাসের মাঝখানে থাকে কম দিনের মাস ফেব্রুয়ারি। ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, যদি কোন বছরে ২ জানুয়ারি পূর্ণিমা হয়, তাহলে ফের ২৯.৫ দিন পর জানুয়ারিতেই হবে দ্বিতীয় পূর্ণিমা। এটি অবশ্যই হবে একটা নীল চাঁদ। স্বাভাবিকভাবে ফেব্রুয়ারিতে কোন পূর্ণিমা থাকবে না। পরে মার্চ মাসের ১ তারিখে আসবে পরের পূর্ণিমা। ফের মার্চ মাসের ৩০ তারিখে হবে দ্বিতীয় পূর্ণিমা যার চাঁদ নীল চাঁদ। ১৯৯৯তে যেটি ঘটেছিল সেটি হয়েছে ৩১ জানুয়ারী ও ৩১শে মার্চ-এ। ছবিটা দেখলে ভাল ভাবে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ওই বিশেষ পূর্ণিমার চাঁদের আগে 'নীল' শব্দটা বসল কেন? সত্যিই কি নীল রঙের? সাধারণ চাঁদের মতোই তো একে রূপালি দেখি। তবে? ব্লু-মুনের চাঁদ ঘটনাচক্রে দু-একবার নীলবর্ণের হয়েছিল, তাই সবার কাছে তা 'নীল' চাঁদ হয়ে গেছে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার অ্যালবার্টা অঞ্চলের বনে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। দাবাগ্নিতে তৈরি হয়েছিল কার্বন সহ বেশির ভাগই ছোট ছোট তেলের সূক্ষ্মকণা। কণাগুলো অস্ট্রেলিয়ার এডিনবরা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেখানে ওই সময় চাঁদের রঙ হয়েছিল নীল। ব্রিটেনের রয়্যাল অবসারভেটরির রবার্ট উইলসন নীলাভ চাঁদ দেখে বলেছিলেন, দাবাগ্নিতে তৈরি তেলের কণাগুলো প্রায় আলোর গড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাতাসে উপস্থিত কণার অণুগুলোর ওপর পড়ে, যারা মাপে আরও ছোট, তখন তা বিশেষ নিয়মে বিক্ষিপ্ত হয় (র‍্যালে বিক্ষেপন)। কণাগুলোর মাপ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হলে বিক্ষেপণের আলো ষোল গুন বেড়ে যায়। আলোক রশ্মির নীল বর্ণের আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্যান্য রঙের আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হওয়ায় বেশি বিক্ষেপিত হয়। দাবাগ্নিতে তৈরি তেলের কণাগুলোর মাপ এমন ছিল যাতে চাঁদের নীল আলো বিক্ষেপণের হার কমে গিয়ে প্রায় সমস্তটাই ওই কণার মেঘ ভেদ করে চোখে পড়েছিল। আর ওই সময় ছিল মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমা। ১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাতের ফলে বাতাসে মিশে যাওয়া বিশেষ ধূলিকণার জন্যও সে দেশের মানুষ চাঁদকে নীল দেখেছিল। ইংরেজরা প্রাচীনকাল থেকে নীল চাঁদ (Blue moon) বলে আসছে। এই চাঁদ ক্বচিৎ কখনো আসে বলেই ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বাক্য তৈরি হয়েছে 'Once in a blue moon' — মানে 'বিরল ঘটনা'। আপনিও সাক্ষী থাকুন ৩১ আগষ্টের চাঁদকে নীল রঙের দেখতে পান কিনা!

অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা ও পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যার চাঁদের বিভিন্ন দশা

ছবিতে E হল পৃথিবীর অবস্থা। S সূর্যের অবস্থান। চাঁদের একটা দিক পৃথিবীর অভিমুখে ও অন্য দিকটি অনভিমুখে থাকে। এখন MN রেখা হল সূর্যের অভিমুখের সঙ্গে লম্ব এবং চাঁদের প্রতিটি অবস্থানে পরস্পরের সাথে সমান্তরাল।

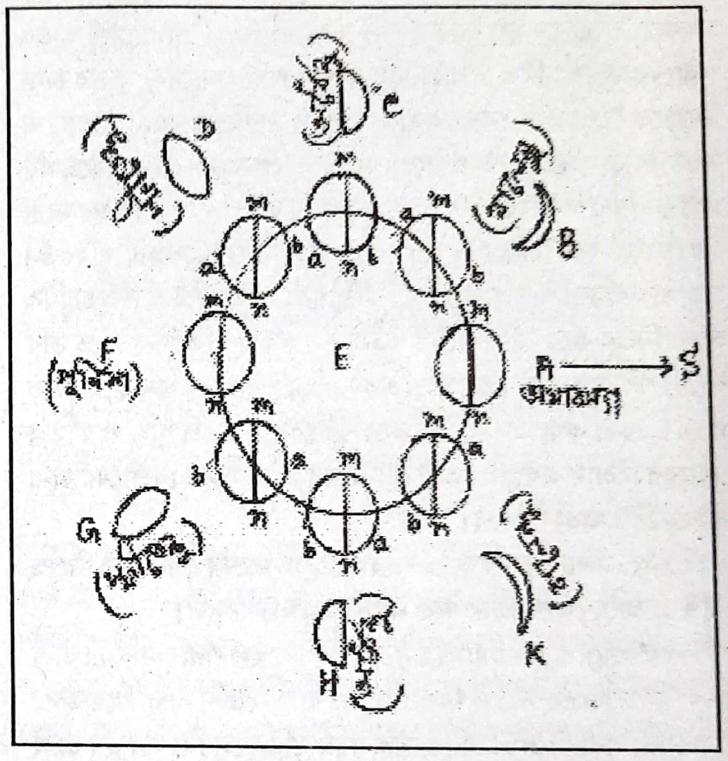

A ও B চাঁদের অর্ধেক অংশ। এই অংশটি দর্শকের দিকে থাকে। এখন চাঁদ A অবস্থানে থাকলে চাঁদের কোন অংশই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। B অবস্থান থেকে দর্শক সামান্য চাঁদের অংশ দেখবে। এই অংশকে বালেন্দু বা ক্রিসেন্ট মুন (Cresent moon) বলে। আবার C অবস্থান থেকে চাঁদের অর্ধেক অংশ দেখা যাবে। একে অর্ধেন্দু বা ডাইকোটোমাইসড (Dichotomised) বলে। চাঁদের চার ভাগে তিন ভাগ অংশ দেখতে পাওয়া যায় D অবস্থানে। একে গিব্বাস মুন (Glbbas moon) বা স্ফীতেন্দু বলে। F অবস্থানে চাঁদকে গোল, উজ্জ্বল চাকতির মতো লাগবে এটা পূর্ণিমা। G,H,K অবস্থানে চাঁদকে ফের D,C ও B অবস্থানে যেমন ছিল সে রকম দেখতে লাগে। পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশ G অবস্থানে কমতে কমতে A বিন্দুতে একেবারে মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ Aতে অমাবস্যা হয়। F বিন্দুতে থেকে চাঁদের ফের F বিন্দুতে আসতে ২৯.৫ দিন সময় লাগে। তাই কোন মাসের ১ বা ২ তারিখে পূর্ণিমা হলে ২৯.৫ দিন পরে অর্থাৎ ৩০ বা ৩১ দিনে ফের পূর্ণিমা হবে।

— লেখক তুষার কান্তি গলুই, মোঃ- ৯৬৩৫৯৩১৩৬২

স্পোর্টস মেডিসিন

1 পাতার পর

jury' শুধুমাত্র আহত খেলোয়াড়কে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাওয়াই এর উদ্দেশ্য নয়—এই Treatment কথাটির ব্যপ্তি বিশাল, 'Sports Medicine' এর বিভিন্ন দিকগুলি একটু বিশদে আলোচনা করলে এর বিশালত্ব সমন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে।

টেনিং ঃ— প্রতিযোগিতামূল খেলার জয়লাভ যদি লক্ষ্য হয় তাহলে শুধুমাত্র খেলায় অংশগ্রহণ করলেই হবে না, এর জন্য চাই বিশেষ প্রস্তুতি বা ট্রেনিং। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে খেলোয়াড় তার শারীরিক ও মানসিক গুনাবলীর বিকাশ ঘটায় এবং সফলতার শিখরে যেতে পারে। শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর মূল নীতি হল— 'Overload Principle' অর্থাৎ শরীরের উপর সঠিক চাপ প্রয়োগ করলে শরীর তা সহ্য করার জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়। কথায় বলে না 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তায় সয়'। এটা শরীরের একটা বিশেষ ধর্ম। দেখা গেছে এই চাপ নেওয়ার ক্ষমতার ৫০ শতাংশ এর বেশী এবং ৯০ শতাংশ এর মধ্যে হয় (নির্ভর করে ট্রেনিংয়ের লক্ষ্যের উপর) তাহলে কার্যকরী পরিবর্তন হয়। প্রকারান্তরে শরীরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আবার এই চাপ অত্যাধিক হলে (নির্ভর করে অ্যাথলিটের বর্তমান সক্ষমতার কি মান আছে তার উপর) শরীরের ক্ষতি হতে পারে এবং ক্রীড়া প্রদর্শনের মান কমে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে শরীরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু শরীরের বিশ্রাম অবস্থায়। তাই ট্রেনিংয়ের মধ্যে সঠিক বিশ্রামের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকা দরকার।

ট্রেনিং বিভিন্ন ধরণের আছে আর প্রত্যেক ধরণের ট্রেনিংয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েকটার কথা নীচে উল্লেখ করা হল।

১) Weight Training ঃ সুঠাম পেশী বহুল শরীর গঠনের জন্য ওজন নিয়ে Isotonic ও Isometric ব্যায়ামগুলি করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে Isotonic ব্যায়ামের সময় সন্ধিস্থলে বিচলন হয় এবং Isometric ব্যায়ামে সন্ধিস্থল স্থির থাকে। Isotonic ব্যায়ামের নাম হল ঃ— Military Press, Half Squat, Supine bench press, two armcurl এবং কয়েকটি Isometric ব্যায়াম হল— Stationary pressbar leg thrust, wall press, shoulder arm tensor.

২) Circuit Training ঃ শারীরিক সক্ষমতা তথা খেলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োগ হয়। এর মধ্যে Weight training এবং Conditioning ব্যায়ামের সংমিশ্রণ থাকে। খেলোয়াড়কে নির্দিষ্ট পরিমান ব্যায়াম কম সময়ের মধ্যে করতে হয় অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যায়াম বিভিন্ন কেন্দ্রে করতে হয়।

উদাহরণ ঃ- A) Squat Thrust - 3/4th of the maximum number of repetitions performed in 1 minute.

B) General flexion Ex-ercise : Perform in two minutes.

C) Abdominal Curls with weight :- 3/4th of maximum number of repetitions.

D) Two arm curls : 3/4th of maximum number of repetitions.

E) Half squat, heels raised :- Exercise with weight-3/4th maximum number of repetitions.

হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের সক্ষমতা বৃদ্ধির (Cardiorespiratory system) জন্য দরকার Interval training (I.T.) জাতীয় ট্রেনিং।

I.T. ঃ— সকল খেলার জন্য সহিষ্ণুতা (Endurance) বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস বা দূরপাল্লার দৌড়ে শরীরে O_2 এর চাহিদা অনেক বেশী হয়। কঠিন পরিশ্রমের ফলেই খেলায় রেকর্ড ভাঙার প্রদর্শন করা সম্ভব। এর জন্য Acrobic Capacity বাড়ানো দরকার, I.T র দ্বারা খেলোয়াড়দের Acrobic Capacity বাড়ানো হয়, I.T এর চারটা ভাগ তাৎপর্যপূর্ণ —

১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

২) ছোট 'Recovery Period' থাকবে যেখানে অ্যাথলিট জগিং করে দেহকে শিথিল করবে।

৩) একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব আগে থেকে ঠিক করা পদক্ষেপে অতিক্রম করবে।

৪) একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব কতবার দৌড়বে তা পূর্ব নির্দিষ্ট থাকবে।

৩০ সেকেন্ড দৌড়ানো ও পরের ৩০ সেকেন্ড জগিং এইভাবে দৌড়তে থাকলে হৃদ্‌স্পন্দন মিনিটে ১২০ উঠলে এবং তা নির্দিষ্ট সময় (১০ মিনিট, ১৫ মিনিট...) পর্যন্ত হলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

টেকনিক বা প্রয়োগ কৌশল ঃ শারীরিক সক্ষমতার চরম শিখরে থাকলেও একজন অ্যাথলিট তার সবচেয়ে ভাল ক্রীড়া প্রদর্শন করতে পারে না, যদি সে ঠিকমত কৌশল প্রয়োগ না করে যেমন—হাইজাম্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহৃত হয়। একজন হাইজাম্পার 'পিজার' বা 'স্ট্রাভেল' স্টাইলে যে উচ্চতা পার হবে 'ফ্রসবেরী' টেকনিকে তার চেয়ে বেশী উচ্চতা পার হবে।

বিভিন্ন খেলাধূলায় বিভিন্ন রকমের টেকনিক ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি টেকনিকের পিছনে কিছু না কিছু বিজ্ঞানের নীতির প্রয়োগ আছে। লং জাম্পের ক্ষেত্রে বেশী দূরত্ব পার হতে গেলে Take off angle 40^0-45^0 হলে যে দূরত্ব যাবে, একই গতিতে এসে 60^0-70^0 কোনে Take off নিলে বা 15^0-30^0 এর মধ্যে Take off নিয়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব যাবে কমে। এখানে প্রাসের (Preyectile) নীতি অনুসরণ করা হয়। এইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতির প্রয়োগে, বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগে বিভিন্ন কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছে। ডিস্‌কাস, বর্শা বা লোহার বল নিক্ষেপের সময় দাড়িয়ে না ছুড়ে কিছুটা ভরবেগ নিয়ে ছুড়লে বেশী দূর যাবে।

ষ্ট্রাটেজি বা ছক ঃ— দলগত প্রতিযোগিতামূলক খেলায় কিভাবে খেললে বিপক্ষকে হারানো যাবে বা দলের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে তার কৌশল বা ছক সাধারত দলের কোচ করে থাকেন। বিপক্ষ দলের ক্ষমতা আন্দাজ করে এটা ঠিক করা হয়। ফুটবলে মার্কিং করে খেলা, ৪-২-৪ ছকে খেলা বা ডায়মন্ড ছকে খেলা এর উদাহরণ।

এরপর 5 পাতায়

স্পোর্টস মেডিসিন

4 পাতার পর

পুষ্টি ঃ—শরীরের কোষ ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ষনাবেক্ষণ করা বা উন্নত করার জন্য এবং জীবন ধারণের জন্য যে সকল খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাকে পুষ্টি বলে। সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে অনেক ধরণের শারীরিক অসুস্থতা যেমন নিরাময় করা যায় তেমনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনেক রকমের জটিল ব্যধিকে এড়ানো সম্ভব।

খেলোয়াড়দের জীবনে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ অপরিহার্য। সঠিক পুষ্টি না হলে পূর্ণশক্তির প্রকাশ হবে না এবং খেলোয়াড়ের ক্রীড়ার মান কমে যাবে।

পুষ্টিকর খাদ্যকে মূলত ঃ ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল শর্করা জাতীয় খাবার, প্রোটিন জাতীয় খাবার, স্নেহ জাতীয় খাবার, মিনারেল, ভিটামিন এবং জল। এছাড়া আছে Antioxidants এবং ফাইটোকেমিক্যালস্ যা সমুদ্রজাত খাবারে পাওয়া যায়।

খেলোয়াড়দের সাধারণ লোকেদের থেকে বেশী পরিমান প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট বা ফ্যাটের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক গেম্সের অ্যাথলেটেরা তাদের বিশাল দক্ষতা প্রদর্শণের জন্য খাওয়া দাওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। Milo Oftweenies একজন খ্যাতনামা কুস্তিগির। সে পরপর পাঁচবার অলিম্পিকে জয়লাভ করেছিল। সে প্রতিদিন ৯ কেজি মাংস, ৯ কেজি রুটি এবং ৮.৫ লিটার মদ খেত। খেলায় ভাল ফল করার জন্য তখনকার দিনে খেলতে নামার আগে মদ্যপান করার রীতি ছিল।

প্রাচীন অলিম্পিকের যোদ্ধাদের খাদ্য তালিকাকে অনুসরণ করেই বর্তমানের Sports Nutrition এর উৎপত্তি হয়েছে। গবেষণা করে দেখা গেছে বিভিন্ন মানের ও ধরণের ব্যায়াম এবং সঠিক খাদ্যগ্রহণ সুস্থ জীবনযাপন করার সহায়ক হয় এবং ইন্সুলিন নির্ভর নয় এই ধরণের মধুমেহ রোগ, রক্তের উচ্চচাপ, হার্টের রোগ, হাড়ের ভঙ্গুরতা, মেদবাহুল্য, মানসিক রোগ, কোলন ক্যান্সার, স্ট্রোক এবং মেরুদন্ডের দূর্বলতা হতে বাধা দেয় বা ঐ সকল শারীরিক দুরবস্থার শুশ্রূষার সহায়ক হয়। তাই সঠিক সুষম আহার খেলোয়াড়দের গ্রহণ করা দরকার। খেলার সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করার জন্য আগত অবস্থা থেকে পূর্বের অবস্থায় দ্রুত ফিরে আসার জন্য নিজের সর্বোচ্চ দক্ষতাকে ধরে রাখার জন্য এবং খেলার আঘাত পেয়ে আহত হবার সম্ভাবনা কমানোর জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। *এরপর আগামী সংখ্যায়*

— লেখক ড. নন্দদুলাল সেনগুপ্ত,
শ্যামনগর কান্তি চন্দ্র হাইস্কুল (উঃ মাঃ)

পরিবেশ কর্মী আক্রান্ত ঃ প্রতিবাদ সভা

৭ আগষ্ট, শান্তিপুর : ৩০ জুলাই, শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি ও নতুনের সন্ধান পত্রিকার ডাঃ গৌতম কুমার পালের বাড়িতে কয়েকজন দুষ্কৃতি মদের বোতল ছোঁড়ে। শান্তিপুরের এই বোমাবাজি ও পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে ৭ আগষ্ট শান্তিপুর ডাকঘর মোড়ে শান্তিপুরের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংস্থার কর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

প্রকৃতি পাঠ

চাঁদের আলোর বাঁধ ভেঙ্গেছে

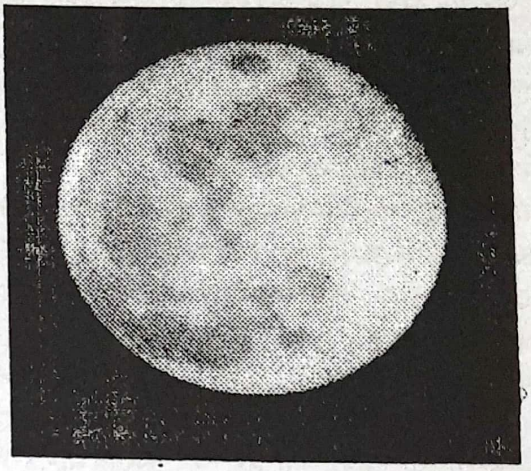

সুপার মুন

প্রতি রাতেই চাঁদ দেখা যায়। তার আলোর কিরণ চোখে পড়ে। কিন্তু গত ৬ই মে রাতের চাঁদ আরও উজ্জ্বল আরোও বড় হয়ে আমাদের দেখা দিয়েছিল। আসলে চাঁদ পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। নিজের কক্ষ পথে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় চাঁদ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে 'পেরিজি'। যেখানে পৃথিবী ও চাঁদের গড় দূরত্ব প্রায় তিন লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। এদিন তা ২৭ হাজার ৪৪৫ কিলোমিটার কমে গিয়েছিল। উজ্জ্বলতাও বেড়ে গিয়েছিল অনেকটা। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এইরকম 'সুপার মুন' ২০১৩ সালের ২৩ জুন আবার দেখা যাবে।

৬ আগষ্ট '১২ হিরোশিমা দিবসে বিজ্ঞান দরবার সংস্থার পক্ষ থেকে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে পরমাণু চুল্লীর বিরুদ্ধে ও বিকল্প শক্তির পক্ষে পোস্টার প্রদর্শনী সহ প্রচার চালানো হয়।

ব্যাঙের বিয়ে ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সহাবস্থান

গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফল ফলতে শুরু করে দিয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তীব্র দাবদাহে মানুষ যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তীব্র দাবদাহের হাত থেকে রেহাই পেতে এবং বৃষ্টির আশায় ২৪শে মে ধুমধাম করেই ব্যাঙের বিয়ে দিল মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের জোরডাঙ্গা গ্রামের হালদারপাড়ার গ্রামবাসীরা। গ্রামের একটি শিবমন্দিরে ছাদনাতলা তৈরি করে ব্যাঙের সিঁদুর দানও করা হয়। সঙ্গে চলে আদিবাসী নৃত্য এবং ভোজ সভা।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে গত পাঁচ বছরের মধ্যে তাপমাত্রার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এবছরের তাপমাত্রা। এ বছর অর্থাৎ ২০১২ সালের ১৫ মে জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ ওঠানামা করছে বলে মানুষ গরমে হাঁসফাঁস করেছেন। ২০০ পরিবারের বসবাস হলেও এই জোড়ডাঙ্গা গ্রামে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপলাইন বা গভীর নলকূপ নেই। গ্রামের একটি কুয়ো এবং পুকুরের জলের ওপরেই বাসিন্দাদের নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে বৃষ্টির জন্যে ভাগ্যদেবতার ওপরেই ভরসা করেছে।

উপরের উদাহরণটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঝে মধ্যেই কুসংস্কারের এই নগ্ন চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। আর এটাই চ্যালেঞ্জ বনের খেয়ে ঘরে মোষ তাড়ানোর উপাধি পাওয়া বিজ্ঞান ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর। কুসংস্কার এবং দূষণের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াইয়ে একক ভাবে জেতা যে সম্ভব নয় এটা ভালোভাবেই জানেন সংগঠনের কুশীলবেরা। তাই মাঝে মধ্যে যৌথ মঞ্চ বা যৌথ উদ্যোগে সামিল হন। কিন্তু নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে সেই লড়াইয়ে প্রতিবারই হেরে যায় যৌথ উদ্যোগের প্রচেষ্টা। তাছাড়া আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে তথ্যের আদানপ্রদান ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারেও সচেতনভাবে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে পরিবেশবাদী ও বিজ্ঞান সংগঠনগুলো। ইন্টারনেট, ইমেল ও ফেসবুকের যুগে বিশ্বকে মুঠোয় নেওয়ার আত্মতুষ্টি থাকলেও ঘরের পাশের সংগঠনের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে অনীহা রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখানো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর। তাই ২৬ মে জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়া-মাদারীহাট ব্লকের দত্ত নিবাসে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর যৌথ মঞ্চ গঠনের সভা সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল আন্দোলনের দিশা দেখানো বেশ কিছু সংগঠন। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতীতে সংগঠিত হওয়া এই ধরণের উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নেতৃত্বের রাশ অন্যের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় সমাজ পরিবর্তনের কান্ডারীরা বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছে বর্তমান উদ্যোগকেই বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে যৌথ উদ্যোগের কথা বলতে হলে পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতির কথা বলতে হয়। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে একটি সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালের ১৪ এবং ১৫ই আগষ্ট গোবরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত এই বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল 'গোবরডাঙ্গা রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট' এই সম্মেলন পরবর্তী আগ্রহ থেকেই আত্মপ্রকাশ ঘটে পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতি বা Eastern India Science Club Association (EISCA) প্রধানত সমন্বয়ের লক্ষ্য সামনে ছিল বলেই পশ্চিমবঙ্গের ১২০টি বিজ্ঞান ক্লাবকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮২ সালের ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। এই সম্মেলনের স্মরণিকায় ইসকার প্রথম নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সভাপতির নাম হিসেবে শংকর চক্রবর্ত্তী এবং সম্পাদক হিসেবে দীপক দাঁ এর নাম লিপিবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ইসকার কাজকর্ম সম্মেলন কেন্দ্রীক হয়ে পড়ে। সংগঠনগত ভাবে দূর্বল হতে থাকে ইসকা। পাশাপাশি ১৯৮৫ সালের ১লা মার্চ গড়ে ওঠে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। ১৯৮৬তে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসক দল সিপিআইএম এর আগ্রহে এবং উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। পরবর্তীকালে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র নামে আলাদা একটি বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারা গড়ে ওঠে। আরও পড়ে কলকাতার ৩৬টি সংগঠন নিয়ে গড়ে ওঠে কলকাতা-৩৬, শুধুমাত্র পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠে সবুজ মঞ্চ। উত্তরবঙ্গেও গড়ে উঠেছিল এন.জি. ফোরাম, পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে নিয়ে আলাদা যৌথ মঞ্চ। এইরকম বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু যৌথ মঞ্চ গড়ে উঠলেও শুধুমাত্র উদারতা ও সদিচ্ছার অভাবে সবকটি যৌথ উদ্যোগই দূর্বল হয়ে পড়েছে অথচ সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে এই যৌথ উদ্যোগগুলো দিশা দেখাতে পারত।

— লেখক জয়ন্ত দাস, মোঃ- ৯৪৩৩৩৮২৯৫৯

পাঠকের চিঠি

বিজ্ঞান অন্বেষক বর্ষ ৯ - (মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট) সংখ্যা ২ ও ৩ পেলাম। 'জল সমস্যা ও ভবিষ্যত' ও 'পিঁপড়ের নানা কথা' প্রবন্ধ দুটি ভালো লাগল। 'সূর্যের বুকে গতিশীল শুক্রকে দেখুন' সহজবোধ্য হয়নি। পরিভাষাগুলো ইংরেজিতে, ইংরেজি অক্ষরে দিয়ে দেওয়া ভালো।

জগন্ময় মজুমদারের কবিতা 'ফুকুশিমা : প্রকৃতির প্রতিশোধ' একটি ভালো কবিতার উপস্থাপন।

বিজ্ঞান অন্বেষক এ আপনাদের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে, তবে ছাপার ভুল বা ভুল ছাপা বানান (ন,ণ) এগুলোর দিকে নজর দেওয়া ভালো।

লেখক-লেখিকারা তাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান মননশীলতায়, সংগৃহীত তথ্যে, অনুভবে, অনুধাবনে তার পরিবেশন প্রক্রিয়ায়, একটি প্রবন্ধ লেখেন ঠিকই দেখতে হবে তা যেন সুস্পষ্ট, ত্রুটিহীন ও গতিশীল হয়।

—প্রণব কুমার কুন্ডু, ২২৩ মিত্রপাড়া রোড, নৈহাটী।

শিশু পৃথিবীর জোড়া চাঁদ!

আশীর দশকে প্রথম দিকে একটা জনপ্রিয় ফিল্মি গান বহু বাঙালির মুখে মুখে গুঞ্জরিত হত—"একটা আকাশটাতে একটাই চাঁদ ওঠে, দুটো চাঁদ কখনো কি চাওয়া যায়...."। অমিত কুমার ও আশা ভোঁসলের কণ্ঠে দ্বৈত এই গানটি যদি ২০১১ সালের আগষ্ট মাসের পর তৈরি হত তবে গীতিকার গানটি রচনার সময় এই কথাগুলো লিখতে পারতেন কি না সন্দেহ! এ পর্যন্ত পড়ে পাঠকের নিশ্চয়ই ব্যাপারটা হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। আসলে চাঁদ নিয়ে আমাদের শতাব্দী-প্রাচীন ধারণাকে প্রায় তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন দুই মহাকাশ বিজ্ঞানী এরিক অ্যাসফাং ও মার্টিন জুৎসি। ৩ আগস্ট ২০১১ বিশ্বখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় চাঁদ নিয়ে তাঁদের যে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে তাবৎ বিশ্ববাসীর চন্দ্রাহত হওয়ার জোগাড়! শিশু পৃথিবীর আকাশে নাকি চাঁদ ছিল দুটো!!

আলোচনার বিষয়বস্তু যখন চাঁদ তখন চাঁদের হাল হকিকত একটু জানা দরকার, চাঁদ আর পৃথিবী সমবয়সী। বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১/৪ ভাগ। কিন্তু চাঁদের পৃষ্টতলের ক্ষেত্রফল আটলান্টিক মহাসাগরের অর্ধেকেরও কম। তাই এর অভিকর্ষ বলের পরিমান পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের ১/৬ ভাগ। তার মানে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে হাই জাম্প প্রতিযোগিতায় তুমি যদি চার ফুট উঁচুতে লাফ দাও, চাঁদে এই প্রতিযোগিতা হলে চব্বিশ ফুট লাফাতে পারবে, মানে প্রায় দোতলা বাড়ির সমান উঁচুতে। ব্যাপারটা আমাদের কাছে মজাদার হলেও চাঁদের কাছে সুখকর নয়। এই কম অভিকর্ষ বলের দরুন চাঁদের মায়া কাটিয়ে তার বায়ুমন্ডল ও কম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌলেরা (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, জার্মেনিয়াম, নিসা ও পারদ) মহাকাশে পালিয়েছে। চাঁদে বায়ু মন্ডল নেই বলে, চিৎকার করে কথা বললেও কেউ কারো কথা শুনতে পাবে না, আর ভোর বা গোধুলিরও কোনো বালাই নেই। চাঁদে দিগন্তে হয় হঠাৎ সকাল হঠাৎ সন্ধ্যে। চাঁদের তাপমাত্রাও চরম। দিনে বেড়ে হয় প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর রাতে কমে প্রায় মাইনাস ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সবই বায়ুমন্ডল না থাকার ফল।

চাঁদ যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তা সবাই জানি। একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদ সময় নেয় ২৭ দিন ৭ ঘন্টা ৪৩ মিনিট ১১.৪৭ সেকেন্ড বা ২৭/(১/৩) দিন। চাঁদ পৃথিবীর মতো নিজের কক্ষেও লাট্টুর মতো পাক খায়। আর এই ঘূর্ণনকালও পৃথিবীকে আবর্তন করার সময়ের সাথে সমান। ঠিক এই কারণেই পৃথিবী থেকে আমরা সব সময় চাঁদের একটি পিঠই দেখতে পাই, উল্টো পিঠটা কখনোই দেখতে পাই না।

চাঁদের আরও একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, চাঁদের পিঠে রয়েছে অসংখ্য গহ্বর। চাঁদের যে সব অংশ খালি চোখে ছায়াচ্ছন্ন মনে হয়, ওগুলোই গহ্বর। আর আলোকিত জায়গাগুলো পাহাড়-পর্বত। চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পর্বত হল লাইবনিৎজ, যার উচ্চতা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার) এর চেয়ে বেশি, ১০,৬৬০ মিটার। আর যে গহ্বরগুলোর কথা বললাম সেগুলোর মাপ এক রকম নয়। কোনো গহ্বরের ব্যাস ১০০০ কিমি তো কোনো গহ্বরের ব্যাস কয়েক মিটার।

পৃথিবী থেকে চাঁদের একটি পিঠই যে আমরা সব সময় দেখতে পাই তা আগেই বলেছি। কিন্তু উল্টো দিক না দেখতে পাই, কী আছে তা তো জানার ইচ্ছে হয়। জানা গেল চাঁদের উভয় দিকের ভূমিরূপ ও উপাদানে রয়েছে বৈষম্য। চাঁদের দৃশ্যমান দিকটিতে যেগুলোকে আমরা গহ্বর বলি পরে জানা গেল ওগুলো আসলে লাভা গঠিত নিচু সমভূমি। উল্টো দিকটা তুলনামূল ভাবে অনেক উঁচু নিচু। শুধু তাই-ই নয় দৃশ্যমান দিকের তুলনায় উল্টোদিকের চন্দ্রত্বক প্রায় ৫০ কিমি বেশি পুরু। তাছাড়া, পৃথিবীর কাছের দিক অর্থাৎ চাঁদের দৃশ্যমান দিকে পটাশিয়াম (K), রেয়ার-আর্থ এলিমেন্টস্ (REE) ও ফসফরাস (P) এর পরিমাণ দূরবর্তী দিকের তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। এই তিনটি উপাদানকে এককথায় বলে (KREEP) । এই (KREEP) এর পরিমাণে বৈষম্যও বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছিল। আর এইসব ভাবনার হাত ধরেই উঠে এল দুটো চাঁদের তত্ত্ব।

ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহবিজ্ঞানী এরিক অ্যাসফাং এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন গবেষক ও বর্তমান বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মার্টিন জুৎসি তাঁদের গবেষণাপত্রে যে দ্বি-চাঁদতত্ত্ব হাজির করেছেন তা মোটেই হেলাফেলার নয়। বরং মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এটা পড়ে নড়েচড়ে বসেছেন।

তাঁদের মডেল অনুযায়ী চাঁদের জন্মলগ্ন থেকেই ওরা ছিল যমজ। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে চাঁদ ছিল দুটো ৮ কোটি বছর ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল তাদের। দুটো চাঁদের রঙ ও উপাদান ছিল একই, আর তাদের কক্ষপথও ছিল স্থায়ী। বর্তমান চাঁদের ছোট এই যমজ ভাইটির নামকরণ করা হয়েছে ট্রোজান চাঁদ। দুই চাঁদ ভাইয়ের উদয় অস্ত অবশ্য এক সাথে হত না। বড় ভাইয়ের পিছু পিছু যেত ছোট ভাই ৬০ ডিগ্রি কৌনিক দূরত্ব রেখে। ছোট চাঁদ, অর্থাৎ ট্রোজান চাঁদের ভর ছিলবড় চাঁদের ১/১৩ অংশ, আর ব্যাসও অনেক কম, মাত্র ১২০০ কিমি।

এখন প্রশ্ন, এই দুই চাঁদ সৃষ্টি হল কেমন করে। বিজ্ঞানীদের অনুমান ৪৫০ কোটি বছর আগে সৌরজগৎ সৃষ্টি হওয়ার ঠিক পর পরই মঙ্গল গ্রহের মতো আকৃতির বিপুল একটি মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায়। প্রচন্ড ধাক্কায় পৃথিবীর গলিত লাভার অনেকটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথিবীর চারদিকে একটি বলয় গঠন করে। এই গলিত আবর্জনার বলয়ের বস্তু পরস্পর জুড়ে গিয়ে তৈরি হয়ে যায় দুটো চাঁদ। আর তারা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চক্কর দিতে শুরু করে। তবে বিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে, এই দুই চাঁদ ভাইয়ের সহাবস্থান বেশিদিন সুখের হয়নি। পৃথিবীর অভিকর্ষীয় টানের সাথে দুটো চাঁদের নিজস্ব টানের প্রতিক্রিয়ায় ওরা পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। এই সময় সূর্যের মহাকর্ষীয় টানের

এরপর ৪ পাতায়

শিশু পৃথিবীর জোড়া চাঁদ

7 পাতার পর

প্রভাবে ছোট চাঁদের কক্ষপথ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। আর তার পরপরই বড় চাঁদের গায়ে ধীরে ধীরে জুড়ে যায় ছোট চাঁদ বা ট্রোজান চাঁদ।

দুই চাঁদের ধাক্কা খুব মৃদু হলেও কোটি কোটি টন চন্দ্রজাত আবর্জনা তৈরি হয় যা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন বেশ কিছুদিন পৃথিবী থেকে চাঁদ দেখা যায়নি। অবশ্য তখন চাঁদের ওই ঘটনা দেখার মতো পৃথিবীতে কোনও প্রাণও ছিল না। এক সময় চাঁদের ধুলো সরে যায়। আর তখন থেকেই চাঁদ দেখতে হয় ঠিক আজকে যেমন। দুই চাঁদের সংঘর্ষের পর দশ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে চাঁদের টুকরোর বর্ষন চলেছে, সবচেয়ে বড় যে টুকরোটি পৃথিবীতে এসে পড়ে তার ব্যাস প্রায় ১০০ কিমি।

অ্যাসফাং ও জুৎসি বলেছেন, যেহেতু চাঁদ সেই সময় অর্ধগলিত অবস্থায় ছিল। ফলে ট্রোজান চাঁদ বড় চাঁদের যে অংশে মিলিত হয় সেই অংশের গলিত তরল উল্টো দিকে গড়িয়ে চলে আসে। সে জন্যই নাকি দৃশ্যমান দিকের অংশে চন্দ্রত্বক বেশি পুরু, সমতল অংশ বেশি এবং পটাশিয়াম, রেয়ার-আর্থ এলিমেন্ট ও ফসফরাসের পরিমান বেশি। আর একই কারণে অদৃশ্যমান দিকের ভূমিরূপ অনেক উঁচু নিচু।

অ্যাসফাং ও জুৎসির এই দ্বিচাঁদ তত্ত্ব সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেফ্রিটেলর প্রশ্ন তুলেছেন, দ্বিচাঁদ তত্ত্ব যদি যঠিক হয় তবে বর্তমান চাঁদের অদৃশ্যমান দিকে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমান বেশি কেন? দুটো চাঁদ যদি একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয় তবে তাদের উপাদানও একই হওয়া উচিত। আবার, তরল গড়িয়ে দৃশ্যমান দিকে চলে আসার জন্য যদি KREEP এর পরিমান ওই দিকে বেশি হয়, তবে তা অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হল না কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। খুব শীঘ্রই নাসা এই উদ্দেশ্যে চাঁদে জোড়া উপগ্রহ পাঠাচ্ছে। উপগ্রহগুলি চাঁদের মানচিত্র তৈরি করবে এবং চাঁদের অভ্যন্তরের উপাদান বিশ্লেষণ করবে। আগামী দিনে দ্বি-চাঁদ তত্ত্ব সর্বসম্মত ভাবে স্বীকৃতি পাবে কি পাবে না তা ভবিষ্যৎই বলবে। কিন্তু আপাতত আসফাং জুৎসি জ্যোর্তিবিজ্ঞানী মহলেই শুধু নয়, বিশ্ববাসীর মনে যে আলোড়ন তুলে দিয়েছেন তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে ক্ষতি কি!

— লেখক সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ (পূর্ববাজার), দঃ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৪৭। চলভাষঃ ৯৪৩৪৫৭০১৩০,

E-mail : janasoumyakanti@gmail.com

বাবুই পাখির বাসা

ছোট্ট বাবুই পাখির নাম করলেই তার বাসার কথা চলে আসবে। বর্ষা শুরুর মুখে পুরুষবাবুই তাল গাছের মাথায় তার বাসার বুনন কাজ শুরু করে। তাল পাতার আঁশ দিয়ে পুরো বাসা তৈরী করে। উল্টো কুঁজোর মতো বাসাটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয়। পুরুষ বাবুই একাধিক বাসা তৈরী করে। এরপর পুরুষ বাবুই অপেক্ষা করে স্ত্রী বাবুই পাখির জন্য। স্ত্রী বাবুই একটি বাসা পছন্দ করে সেটিতে প্রবেশ করে। তাঁর আহ্বানে পুরুষ বাবুই বাসাতে প্রবেশের অনুমতি পায়।

সঙ্গের ছবিটি শ্যামনগরের বর্তী বিলের। ছবিটিতে ব্যস্ত পুরুষ বাবুইকে দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ঃ তাপস মজুমদার

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন ৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in